ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাঁওতালদের বিভিন্ন পর্ষদ

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু*

সারসংক্ষেপ: সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ নৃ-গোষ্ঠী। তাদের বাসস্থান মূলত উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে সাঁওতালরা বহুকাল যাবৎ এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যে তারা স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তাদের রয়েছে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। সচেতন ও স্বাধীনচেতা হিসেবে তাদের বেশ সুনাম রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সাঁওতালদের সামাজিক অনুশাসনের জন্য গঠিত বিভিন্ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তার পূর্বে বাংলাদেশে সাঁওতালদের আগমনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী, মহালি, মুণ্ডারি, মালপাহাড়ি, মাহাতো, শিং, রাজোয়ার, লাহার, তুরি, মুরারি, ভূমিজ, কোচ, পাহান, বোনা, কৈবর্ত, কোল, ভূঁইমালি, গোড়াত, বাইছনি, দুষাত, লহরা, ঘাটোয়াল, বেতিয়া, নুনিয়াছড়ি, রাই, বেদিয়া, বাগদি, গণ্ড, চাঁই, আঙ্গুয়াররাজোয়ার প্রভৃতি প্রায় ৩৫/৪০টি সম্প্রদায়ের খোঁজ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। তবে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, পাবনা, যশোর, খুলনা এমনকি চট্টগ্রাম জেলাতেও অল্পসংখ্যক সাঁওতালদের বসতি ছিল।

বাংলাদেশে বর্তমানে সাঁওতালদের সংখ্যা কত তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে যে সব আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে স্বতন্ত্রভাবে সাঁওতালদের গণনা করা হয়নি। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) যে আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় তাতে সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের গণনা করা হয় একই সঙ্গে। এ থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হলো —

দিনাজপুর	—	৪১, ২৪২ জন
রংপুর	—	৪,২৯২ জন
রাজশাহী	—	১৯,৩৭৬ জন।
বগুড়া	—	১,৮৬১ জন।
পাবনা	—	১৭০ জন।[১]

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৩ সালে। কিন্তু উক্ত আদমশুমারিতেও সাঁওতালদের স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হয়নি। এ কাজে বরং অগ্রণী ভূমিকা

*অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পালন করে খ্রিস্টান মিশনারিরা। ১৯৭৬ সালে দিনাজপুরের মিশনারি কর্মকর্তা মি. পিটার মেকনিক সাঁওতালদের সংখ্যা ৮০ হাজার বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই হিসেব যথার্থ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। কেননা তাঁর গণনার তিন বছর পর দিনাজপুরের লুথেরান মিশনের রেফারেন্ড মি. বোর্ন রোরবি থানাভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে সাঁওতালদের যে সংখ্যা নিরূপণ করেন তা অনেকটা ভিন্ন। মি. বোর্নের প্রতিবেদনে দিনাজপুরের ১৯টি থানায় সাঁওতালদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩,১৯৬ জন।[২] এক্ষেত্রে মি. বোর্নের রিপোর্ট অনেকাংশে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে ১৯৮৫ সালের জুন মাসে প্রকাশিত আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা, রাজশাহীর এক প্রতিবেদনে এই জেলার সাঁওতালের সংখ্যা ৪১,০০২ জন বলে উল্লিখিত হয়। রংপুর ও বগুড়া জেলার সাঁওতালদের সংখ্যা এরূপ সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। তবে ১৯৭৬ সালে মি. মেকনিক এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সাঁওতালের সংখ্যা ২ লক্ষ বলে উল্লেখ করেন।[৩]

অস্ট্রিকভাষী এই জনগোষ্ঠী উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে কখন কীভাবে সাঁওতাল নামে পরিচিত হয় এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর আছে। Skrefsred এর মতে, সাঁওতাল কথাটির উদ্ভব ঘটেছে সুতার (Soontar) থেকে। কেউ কেউ আবার বলেছেন তারা সুদীর্ঘ 'ষাঁওত' বা সমভূমিতে বাস করার ফলে তাদের প্রচলিত নাম হয়ে পড়ে সাঁওতাল। আবার অনেকে সাঁওতালদের পূর্ব জাতিগত পরিচয় 'খেরওয়ার' বলেও অভিহিত করে থাকেন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সাঁওতালের পরিবর্তে 'সানতাল' বলতে পছন্দ করে। আর নিজেদের মধ্যে যখন তারা আলোচনা করে তখন, নিজেদের 'হড়' বলে সম্বোধন করে থাকে। হড় শব্দের অর্থ মানুষ।[৪]

সাঁওতালরা যে এদেশের ভূমিজ সন্তান নয়-বহিরাগত এ সম্পর্কে প্রায় সকল গবেষকেরই অভিমত অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে Sir Edward Gait এর মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

The language of Mundas with their kindred dialects spoken by the santals, Hos, and the other allied tribes inhabiting the Chotanagpur platean, has been shown by Peter Schmidt to form a sub-family of the family called by him Austro-Asiatic, which includes Mon Khmer, Wa, Nicoborese, Khasi and the aboriginal language of Millacca. There is another family which he calls Austronesian including Indonesian. Melanesian and Polynesian. These two families are grouped into one great family which he calls the Austric.[৫] যাহোক সাঁওতালরা যে পাক-ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী এতে কেন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ অনুমান করেন। এরা পাক-ভারতের প্রাচীনতম আর্যদের অনেক পূর্ব থেকেই এদেশে বসবাস করছে। তবে ঠিক কোন সময় এবং কোথা থেকে এদের আবির্ভাব এ সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে Sir William Hunter-এর মতবাদটিও দ্ব্যর্থবোধক। তিনি উল্লেখ করেছেন, সাঁওতালরা পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গে আগমন করে এবং অতঃপর পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পূর্বাঞ্চল কোথায় তা আজও অজানাই রয়ে গেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে সাঁওতালরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস করছিল। ১৮৩৬ সালে বৃটিশ সরকার তাদেরকে নির্বিঘ্নে বসবাসের জন্য একটি স্থায়ী এলাকা নির্ধারিত করে দেয়। এই এলাকা সাঁওতাল পরগণা নামে খ্যাত হয়। এখানে তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই বসবাস করতে থাকে। তাদের শ্রমলব্ধ ফসলেই তাদের সারা বছর চলে যেত। কিছুদিন পর বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংকটময় পরিণামের দরুন সেখানে হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের উদ্ভব ঘটে। তারা সেখানে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ-দাদন ইত্যাদি ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটালে সরল বিশ্বাসী গরীব সাঁওতালরা তাদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাতে বসে, তাদের মধ্যে ক্রীতদাস প্রথার উদ্ভব ঘটে। দিনমজুর সাঁওতালদের দৈনিক পরিশ্রমে যে পাওনা হতো তা শুধু মহাজনদের ঋণ পরিশোধের খাতায় জমা হতো। অথচ মহাজনদের হিসাবের হেরফের অনুযায়ী আসল ঋণ পরিশোধের কিছুই হতো না। এমন কি এক জীবনে কোন সাঁওতালের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হতো না। একদিন সাঁওতালরা নিজেদের দুর্দশার সকল কারণ বুঝতে পেরে প্রবল প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহই ১৮৫৫ সালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাঁওতাল বিদ্রোহ।[৬] বৃটিশ সরকার কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহে দশ হাজার নিরীহ সাঁওতাল নিহত হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহে ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের মনে নানারূপ দ্বিধা দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং অনেকেই সাঁওতাল পরগণায় থাকা নিরাপদ মনে না করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ড. পিয়ের বেসাইনেট উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সাঁওতালদের অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা থেকে আগমন করেছে।[৭]

সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর। এদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, চুল কালো ও কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু। এই দীর্ঘমুণ্ড প্রশস্ত নাসা সাঁওতালদের সঙ্গে মুণ্ডা, ওরাওঁ, মালপাহাড়ি ও অনুরূপ আদিবাসীদের দেহ বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও সংস্কৃতিগত যথেষ্ট মিল রয়েছে। মিল রয়েছে তাদের গ্রামীণ পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এবং সেইসঙ্গে তাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য অনুরাগের ক্ষেত্রেও। সাঁওতালগণ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদিবাসিন্দা, এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষি সংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত।[৮]

বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে সাঁওতালরা যে সমাজ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে আসছে তা আজ অবধি অলিখিতভাবেই চলে আসছে। যদিও সাঁওতালদের কোন নিয়ম, রীতিনীতি ও প্রথাসমূহ লিখিত আকারে নেই, তথাপি সাঁওতালরা আইন বর্জিত সমাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে, সাঁওতালদের এমন কতকগুলো অলিখিত সামাজিক অনুশাসন রয়েছে, যা সাঁওতালরা দৈনন্দিন জীবনে সর্বোতভাবে ও সর্বক্ষেত্রে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর। যার ফলে সাঁওতাল বা তাদের সামাজিক ব্যবস্থার রীতি-নীতিসমূহ প্রয়োগ করে সামাজিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি সহনশীলতা দেখিয়ে থাকে। যার ফলে আজও সাঁওতালদের কৃষ্টি সংস্কৃতির রীতিনীতি ও প্রথাসমূহ অলিখিতভাবে আপনগতিতে চলমান।[৯] এতে সমাজ ব্যবস্থার কার্যক্রমে কোন প্রকার জটিলতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ নেই।

উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের গ্রামপর্যায়ে রয়েছে মান্‌ঝি পরিষদ, কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত পরগনা পরিষদ এবং সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে রয়েছে দিঘরী পরিষদ। কিছুদিন পূর্বেও এসব পরিষদের কার্যক্রম তেমন কার্যকর ছিল না। সাম্প্রতিককালে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা ASUS সহ বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এর উদ্যোগে সাঁওতাল সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং তাদের স্ব-শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। এবারে আসা যাক সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পরিষদের পরিচিতি ও কার্যক্রমের আলোচনায়—

মান্‌ঝি পরিষদঃ

সাঁওতাল সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে এবং পুরুষানুক্রমিকভাবে গ্রামভিত্তিক একটি সমাজ কাঠামো আছে, যা দিয়ে তারা এক একটি গ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। প্রাচীনকাল থেকেই এই গ্রামভিত্তিক সমাজ কাঠামো আজ অবধি সাঁওতাল গ্রামসমূহে তাদের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছে। এই সমাজ কাঠামোটিই মান্‌ঝি পরিষদ বলে পরিচিত। এই মান্‌ঝি পরিষদে ৭ জন সদস্য থাকেন। একজন সদস্যের একেকটি কাজ থাকে যা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রত্যেক সাঁওতাল গ্রামে তাদের সমাজ পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ কাঠামো রয়েছে। যেমন—

১) মান্‌ঝি হাড়াম
২) পারানিক
৩) নাইকি (পুরোহিত)
৪) জগ মান্‌ঝি
৫) জগ পারানিক
৬) গোডেৎ
৭) কুডাম নাইকি[১০]

সাম্প্রতিককালে মান্‌ঝি পরিষদের গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়েছে। আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা (ASUS) এর সহযোগিতায় রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলার রিশিকুল ইউনিয়নের আদাড়পাড়া, নিমতলী মহাপাড়া এবং কদমা ফুলবাড়ি ও কাঁকন হাটের সাঁওতাল গ্রামের মান্‌ঝি পরিষদের সদস্যবৃন্দ এ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। নিম্নে উক্ত গঠনতন্ত্রের আলোকে মান্‌ঝি পরিষদের পরিধি, মেয়াদকাল, সদস্যদের যোগ্যতা ও সম্মানী, কর্মপরিধি (ক্ষমতা ও দায়িত্ব) ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হলো:

মান্‌ঝি পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

১. বাংলাদেশের নাগরিক ও সাঁওতাল আদিবাসী পরিবারের সদস্য হতে হবে।
২. নির্বাচিত গ্রামে কমপক্ষে ১০ বছর যাবৎ বসবাস করতে হবে।
৩. নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স হতে হবে।
৪. কিছু লেখাপড়া জানলে ভালো। সাঁওতালদের আইন-কানুন সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।
৫. ভালো চরিত্রের অধিকারী হতে হবে ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা থাকবে হবে।

মান্‌ঝি পরিষদের মেয়াদকাল:

মান্‌ঝি পরিষদের সদস্যবৃন্দ ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ৫ বছর পূর্ণ হলে নিয়মানুসারে তাদের সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। মান্‌ঝি হাড়াম তার ৫ বছর মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার ১ মাস পূর্বে গ্রামের লোকদেরকে নিয়ে সভা ডাকবেন এবং পরবর্তী ৫ বছরের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। সেই দিনই পরবর্তী ৫ বছরের জন্য মান্‌ঝি পরিষদ গঠিত হবে। মান্‌ঝি পরিষদ গঠিত হলে পুরাতন মান্‌ঝি নির্বাচিত মান্‌ঝি পরিষদের কাছে দায়িত্ব প্রদান করবেন।

নির্বাচন পদ্ধতি:

মান্‌ঝি পরিষদের সদস্য নির্বাচন ২টি পদ্ধতিতে করা হয়।

১. নাম আহ্বান করে।
২. গোপন ভোটের মাধ্যমে।

নাম আহ্বান করে:

এই পদ্ধতিতে গ্রামের সব লোকজন গ্রাম্য যদি কেউ এক জনের নাম প্রস্তাব করেন এবং সবাই হ্যাঁ করেন তাহলে তিনি নির্বাচিত হবেন। অনুরূপভাবে সবাই এভাবে প্রস্তাব করবে এবং সমর্থনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

গোপন ভোটের মাধ্যমে: নাম প্রস্তাবের মাধ্যমে নির্বাচিত না হলে গোপন ভোট পদ্ধতির মাধ্যমে মান্‌ঝি পরিষদের সদস্য বাছাই করা হবে। এই পদ্ধতিতে বাছাইয়ের জন্য গ্রামের ১৮ বছর বয়সের লোকদের ভোটার তালিকা তৈরি করা হবে। ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট দিন তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। সেদিন ভোট হবে এবং ভোট গণনা করা হবে। সেদিনই নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হবে।

মান্‌ঝি পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো: মান্‌ঝি পরিষদের নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে থেকেই মান্‌ঝি, জগ মান্‌ঝি, পারানিক, জগ পারানিক, নাইকি, কুডোম নাইকি এবং গোডেং বাছাই করা হয়।

বেতন:

১. মান্‌ঝি হাড়ামের বেতন: মান্‌ঝি হাড়াম প্রতি পরিবার থেকে বছরে ১০/- (দশ) টাকা করে পাবেন। মান্‌ঝি মান জমি থাকলে তা সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা হবে। সেই জমির উপর মান্‌ঝির কোন অধিকার থাকবে না।
২. পারানিক: পারানিক প্রতি পরিবার থেকে বছরে ৭/- (সাত) টাকা করে পাবেন।
৩. নাইকি: নাইকি বা পুরোহিত গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে বছরে ৭/- (সাত) টাকা করে পাবেন।
৪. জগ মান্‌ঝি: জগ মান্‌ঝি গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে বছরে ৫/- (পাঁচ) টাকা করে পাবেন।
৫. জগ পারানিক: জগ পারানিক গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে বছরে ৫/- (পাঁচ) টাকা করে পাবেন।
৬. গোডেৎ: গোডেৎ (সংবাদ দাতা) গ্রামের প্রতি পরিবার থেকে বছরে ৫/- (পাঁচ) টাকা করে পাবেন।

মান্‌ঝি পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সমূহ

মান্‌ঝি হাড়ামের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

১. মান্‌ঝি হাড়াম হলেন মান্‌ঝি পরিষদের প্রধান এবং সমগ্র গ্রামের নেতা বা প্রধান।
২. মান্‌ঝি হাড়াম শাসন জারি করবেন এবং তার আদেশে জনগণ চলবে।
৩. মান্‌ঝি হাড়াম গ্রামে একটি থান তৈরি করবেন। বিচার-আচার, পূজা-পার্বণ সেই থানে করা হবে। মান্‌ঝি হাড়াম গ্রামের সভাতে সভাপতিত্ব করবেন।
৪. মান্‌ঝি হাড়াম গ্রামের লোকদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য চেষ্টা করবেন। বিচার-আচার করবেন এবং বিরোধ মীমাংসা করবেন। বিচারে শাস্তি প্রদান করতে পারবেন এবং জরিমানা করার ক্ষমতা তার আছে।
৫. মান্‌ঝি হাড়াম ছাড়া গ্রামের কোন কাজ কোন ব্যক্তি করতে পারবে না। এমনকি নিজের কাজ ও জমি বিক্রির ক্ষেত্রে মান্‌ঝি হাড়ামকে অবহিত করতে হবে।
৬. গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের লোকদের বা নিজ বিয়ে বা অন্য কোন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মান্‌ঝি হাড়ামের সহায়তা প্রয়োজন আছে।
৭. বাহির থেকে কোন লোক গ্রামে আসলে গ্রামের মান্‌ঝির সাথে দেখা করবে এবং যে কোন কাজে তিনি সহয়তা প্রদান করবেন।
৮. সরকারের লোক বা অন্য কেউ সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে চাইলে তাহলে প্রথমে মান্‌ঝি হাড়ামের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
৯. মান্‌ঝি হাড়াম মাঝে মাঝে গ্রামের যে কোন বিরোধ মীমাংসার জন্য সভা আহ্বান করতে পারবে।
১০. মান্‌ঝি হাড়াম তার কাজের বিবরণ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করে রাখবেন।

পারানিকঃ

১. পারানিক হল মান্‌ঝির কাজের সহকারী।
২. মান্‌ঝি হাড়াম এর অবর্তমানে পারানিক মান্‌ঝি হাড়াম এর কাজ সম্পাদন করবেন।
৩. মান্‌ঝি হাড়ামের কাজ তিনি লিখে রাখবেন। পরবর্তী বিচার দিন কবে হবে সেই বিষয়ে জনগণকে তিনি অবহিত করবেন।
৪. বছরের শেষে বার্ষিক মিটিং-এ বার্ষিক কী কী কাজ করা হয়েছে তা জনগণকে অবহিত করবেন।
৫. গ্রামের নির্বাচনের ব্যাপারে যা কাজ করতে হবে সেই সমস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।
৬. চাষ-বাসের ব্যাপারে তিনি নতুন নতুন পন্থা বা পদ্ধতির কথা জনগণকে অবহিত করবেন।

নাইকি (পুরোহিত)ঃ

১. নাইকি গ্রামের সমস্ত পূজা অর্চনা বা ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করবেন। মান্‌ঝি হাড়াম এবং পারানিকের পরামর্শক্রমে পূজা-পার্বণের দিন তারিখ নির্ধারণ করবেন।

২. নাইকিকে জানানো ছাড়া গ্রামের কোন পূজা অর্চনা করা যাবে না। এমনকি নিজের পরিবারে নিজের লোকের দ্বারাও পূজার্চনা করার ক্ষেত্রে নাইকির অনুমতির প্রয়োজন আছে।
৩. নাইকি তার কাজের বিবরণ লিখে রাখবেন।
৪. বছরের শেষে বার্ষিক সভায় তিনি তার কাজের বিবরণ গ্রামের লোকেদেরকে অবহিত করবেন।

জগ মান্‌ঝিঃ

১. গ্রামের যুবক-যুবতীদের দেখাশুনা ও শাসন করবেন।
২. তিনি গ্রামের সমস্ত যুবক-যুবতীদের তালিকা তৈরি করে সংরক্ষণ করবেন।
৩. যুবক-যুবতীদের চরিত্র গঠন, স্বাস্থ্য এবং কর্মদক্ষতা বা কার্যক্ষমতা যেন ভালো থাকে সেদিকে তিনি নজর রাখবেন।
৪. একজন যুবক-যুবতী নষ্ট হয়ে গেলে তার জবাবদিহিতা জগ মান্‌ঝিকে দিতে হবে। তাছাড়া একজন কেউ ভালো কাজ করলেও তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করাও জগ মান্‌ঝির দায়িত্ব।
৫. গ্রামের যুবক-যুবতীদের চরিত্র গত সনদপত্র জগ মান্‌ঝি প্রদান করতে পারবেন।
৬. বার্ষিক মিটিং-এ তার কাজের প্রতিবেদন গ্রামের লোকেদেরকে অবহিত করবেন।
৭. গ্রামে নেশাদ্রব্য বানানো, ব্যবহার এবং নেশাগ্রস্ত দমন করবেন।

জগ পারানিকঃ

১. মান্‌ঝির সহকারী হিসাবে কাজে সহায়তা করবেন।
২. পারানিক এর অবর্তমানে জগ পারানিক তার দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. গ্রামের সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান ইত্যাদির তথ্য সঠিক জেনে মান্‌ঝিকে অবহিত করবেন।
৪. অন্য গ্রামে মান্‌ঝি হাড়ামের প্রতিনিধি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে মান্‌ঝি হাড়ামের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৫. গ্রামের নির্বাচনের ব্যাপারে পারানিককে সহায়তা প্রদান করবেন।

গোডেৎঃ

১. মান্‌ঝির কোন সার্কুলার বা নোটিশ গ্রামের লোকদেরকে জানানোর দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত।
২. কোন ব্যক্তি যদি কোন সংবাদ জানতে না পারে তবে তার জন্য গোডেৎকে জবাবদিহি করতে হবে।
৩. গ্রামের কোন খবর বা কথা গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অধিকার তার নাই বা এখতিয়ার নেই।
৪. পূজা-পার্বণে মান্‌ঝি বা নাইকির নির্দেশে তিনি গ্রামের লোকদের একত্র করবেন।

৫. গোডেৎ নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারবেন না। তিনি মান্‌ঝির নির্দেশে কাজ করবেন। যা কিছু কাজ তিনি করবেন তা মান্‌ঝিকে জানিয়ে করবেন।

কুডৌম নাইকিঃ

১. কুডৌম নাইকি পূজা-পার্বণে নাইকিকে সহায়তা প্রদান করবেন।
২. নাইকির অবর্তমানে নাইকির কাজ কুডৌম নাইকি সম্পাদন করবেন।
৩. নাইকিকে জানানো ছাড়া তিনি কোন পূজার্চনার কাজ করতে পারবেন না।
৪. পূজা-অর্চনার জন্য যদি রক্তের প্রয়োজন হয় তবে কুডৌম নাইকিকে তা দিতে হবে।

পদ বিলুপ্তিঃ

১. ৫ বছর পূর্ণ হলে মান্‌ঝি পরিষদের যে কেউ আপনা আপনি বা নিয়মানুযায়ী মান্‌ঝি পরিষদ থেকে বাদ যাবেন।
২. সময় পূর্ণ হলে মান্‌ঝি পরিষদের যে কেউ নিজে নিজে পদত্যাগ করে বাদ হয়ে যেতে পারেন।
৩. মান্‌ঝি ছাড়া অন্য কেউ যদি অন্যায় কাজ করে তবে মান্‌ঝির মাধ্যমে গ্রামের লোককে জানিয়ে মান্‌ঝি পরিষদ থেকে তাকে বাদ দেওয়া হবে।
৪. যদি মান্‌ঝি নিজেই অন্যায় কাজ করে থাকেন বা অন্যায় কাজে জড়িত থাকেন তাহলে মান্‌ঝি পরিষদের যে কেউ বা গ্রামের পক্ষ থেকে যে কেউ মান্‌ঝি সরানোর ব্যাপারে কথা তুলতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে গ্রামে সভা ডেকে মেয়াদ পূর্ণ না হলেও সেই পদ থেকে তাকে বাদ দেওয়া হবে।
৫. বাদ দেওয়া ব্যক্তি তার সমস্ত দায় দায়িত্ব বা সম্পত্তির হিসাব নিকাশ মান্‌ঝি পরিষদের কাছে অর্পণ করে চলে যাবেন।
৬. যে কোন কারণে মান্‌ঝি পরিষদের কোন সদস্য থাকতে না চাইলে বা কোন সদস্যর মৃত্যু ঘটলে তার পদ বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু সেই পদ পূরণের জন্য সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজনকে বাছাই করতে হবে।[১১]

পরগনা পরিষদঃ

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী পরগনা পরিষদ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোন সমস্যা মান্‌ঝি পরিষদ সমাধান করতে না পারলে বিষয়টি পরগনা পরিষদে নিয়ে যাওয়া হয়। পরগনা পরিষদ এককভাবে বা আরো অন্যান্য পরগনা পরিষদের সহায়তায় বিষয়টি নিষ্পত্তি করে থাকেন। কোন পরগনা পরিষদের এলাকা বড় হলে উক্ত পরগনা পরিষদ এক বা একাধিক দেশ মান্‌ঝি রাখতে পারে। তবে পরগনা পরিষদ এবং দেশ মান্‌ঝিগণ সকলেই সমাজের সর্বসাধারণ কর্তৃক নিযুক্ত বা নির্বাচিত। কাজেই সর্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাড়া এর কোন পরিবর্তন বা রদবদল করা যাবে না। একটি পরগনা পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপঃ

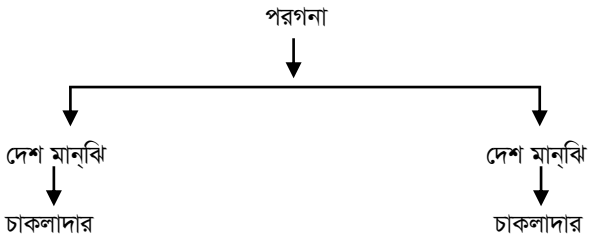

পরগনা পরিষদের গঠন পদ্ধতি হলো একটি নির্দিষ্ট এলাকার সকল মান্‌ঝি পরিষদ এবং সমাজের সর্বসাধারণ কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় একসাথে বসে মান্‌ঝিদের মধ্যে থেকে একজন এলাকা প্রধান নিযুক্ত বা নির্বাচিত করবেন। তিনি পরগনা হিসাবে পরিচিত এবং সম্মানিত। তার জন্য সর্বসাধারণ একজন চাকলাদার নিযুক্ত বা নির্বাচিত করবে। আর কোন এলাকা যদি বড় হয় তাহলে তাকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বসাধারণ একজন বা একাধিক সহকারী নিযুক্ত বা নির্বাচিত করবেন। এরাই এলাকার দেশ মান্‌ঝি হিসাবে পরিচিত বা সম্মানিত। কোন একটি পরগনার অধীনে সর্বনিম্ন ১০(দশ)টি গ্রাম বা মান্‌ঝি পরিষদ থাকবে এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনের)টি গ্রাম বা মান্‌ঝি পরিষদ থাকবে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য পরগনা পরিষদে আসলে পরগনা বিষয়টি সরাসরি নিষ্পত্তি করতে পারবেন অথবা নিষ্পত্তির জন্য দেশ মান্‌ঝির নিকট প্রেরণ করতে পারবেন।

কার্যাবলী:

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিধান অনুযায়ী পরগনা পরিষদের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১. পরগনা পরিষদ তার এলাকাভুক্ত মান্‌ঝি পরিষদের নিকট থেকে সকল প্রকার আপত্তি গ্রহণ করবে এবং বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখবে।
২. পরগনা পরিষদ তার এলাকাধীন মান্‌ঝি পরিষদ নিয়ে প্রতি ২ মাস অন্তর একটি করে সভা বা মিটিং করবেন।
৩. পরগনা পরিষদ বৎসরে কমপক্ষে ২ বার করে প্রতি মান্‌ঝি পরিষদ পরিদর্শন করবেন।
৪. পরগনা পরিষদ এলাকার সমাজ প্রধান হিসাবে মর্যাদা পাবেন এবং সর্বক্ষেত্রে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবেন।
৫. পরগনা পরিষদ স্থানীয় সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং দেশের প্রচলিত ও বিদ্যমান আইন-কানুন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবেন।

মেয়াদ:

পরগনা পরিষদের মেয়াদকাল ও বা কার্যকাল অনূর্ধ্ব ৩ বছর হবে।

যোগ্যতা:

পরগনা একজন শিক্ষিত, সৎ এবং কর্মঠ ব্যক্তি হবেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

দিঘরী পরিষদঃ

সাঁওতাল সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী দিঘরী পরিষদ বলে স্থায়ী কোন পরিষদ নেই। তবে এর অস্তিত্ব রয়েছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ে সামাজিক বিধান অনুযায়ী দিঘরী পরিষদ হলো সর্বোচ্চ পরিষদ। এই পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সামাজিক আইন হিসাবে মর্যাদা পেয়ে থাকে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী জাতীয় কোন সমস্যা দেখা দিলে পরগনা এবং মান্‌ঝি পরিষদসহ সমাজের সকল লোকদের নিয়ে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একজনকে বৈঠকের প্রধান হিসাবে মনোনীত করা হয়। তিনিই হলেন দিঘরী বা দিঘরী বাবা। বৈঠক শেষ হলে তার প্রধানত্ব আর থাকে না। তিনি তার পূর্বের জায়গায় ফিরে যান। তবে বর্তমান সময়ে অনেকেই মনে করেন দিঘরী পদটি একটি স্থায়ী পদ হওয়া উচিত এবং দিঘরী বা দিঘরী বাবা হিসাবে একজনকে নিযুক্ত বা নির্বাচিত করা উচিত। যিনি হবেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ে ঐক্যের প্রতীক এবং যিনি একজন পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করবেন।[১৩]

বর্তমানে সাঁওতালদের নেতৃত্বের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্বে সাঁওতাল সমাজের ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামোতে নেতৃত্ব শুধু যৌথ সমর্থনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতো। কিন্তু বর্তমানে আলোচনা ও ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এর ফলে একটি সমাজে দুই পক্ষ হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজে দুটি পক্ষের মতামত বিরাজ করার জন্য সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়। অন্যদিকে সাঁওতাল সমাজের লোকেরা ব্যাপক হারে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় ধর্মের ভিত্তিতে নেতৃত্ব প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফলে পূর্বের সমাজ কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সমাজ বিভক্ত হচ্ছে। সাথে সাথে তাদের নিজেদের আত্মার সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে।[১৪]

বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সাঁওতালদের স্বীকৃতি না থাকায় তারা নিজেদের অসহায় মনে করে। তারা তাদের শক্তির উৎস খুঁজে পায় না। এই সুবাদে অন্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকেরা সুযোগ গ্রহণ করে। তাই অনেকেই ঐতিহ্যগত সাঁওতালদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত হানে ও তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে।

পরিশেষে বলা যায়, সাঁওতালদের জাতীয়তাবোধের অভাব এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদেরকে ক্রমাগত অসহায় করে তুলছে। এখনই তাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাঁওতাল সমাজের নিজস্ব ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামো পুনরুদ্ধার ও কার্যকর এবং গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। তাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থার সু-ব্যবস্থাপনায় ও সংস্কৃতির বিকাশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করতে পারে। তাছাড়া তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করাও খুবই জরুরি।

তথ্যসূচিঃ

১. জেলা গেজেটিয়ার, ঢাকা, ১৯৬১ (রাজশাহী-পৃ. ৫৩-৫৭, পাবনা-পৃ. ৩৫-৩৬, রংপুর, পৃ. ২৩, দিনাজপুর- পৃ. ৩৩)

২. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের আদিবাসী*, আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমী দিনাজপুর, ১৯৮০, পৃ. ৯

৩. ফাদার স্টিফেন গোমেজ, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংগ্রহ থেকে।

৪. সঞ্জীব দ্রং, *বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী*, ঢাকা. ২০০১, পৃ. ২৪৫

৫. S.C. Roy. *The Mundas and their country*, culcutta 1912, p-Introduction.

৬. আব্দুস সাত্তার, অরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ-২৬৬

৭. Dr. Pierre Bessaignet, *Tribes of the Northern Borders of Eastern Bengal: Social Research in East Pakistan,* Dhaka, 1960, P-152-157

৮. *বাংলা পিডিয়া*, *১০ম খণ্ড*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১০৪

৯. সাক্ষাৎকার: মহান মার্ডি, গ্রাম: মহানইল, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১০. গণেশ মাঝি, *সাঁওতালদের সামাজিক কাঠামো ও বর্তমান অবস্থা*, আদিবাসী স্ব-শাসন, আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, পৃ. ৭

১১. গ্রাম্য মান্‌ঝি পরিষদের গঠনতন্ত্র, *আদিবাসী স্ব-শাসন*, আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, পৃ. ২৩-২৭

১২. এ্যাডভোকেট মাইকেল সরেণ, *পরগনা পরিষদ*, আদিবাসী স্ব-শাসন, আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, পৃ. ২০-২১

১৩. দিঘরী পরিষদ, *আদিবাসী স্ব-শাসন*, আদিবাসী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী, পৃ. ২২

১৪. গণেশ মাঝি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮